দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 SEP 1988
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

ইংরেজীকে উপেক্ষা করা অযৌক্তিক

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে— একথা বলাতে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালীরা যেভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিলো, রাষ্ট্রভাষা ইংরেজী হবে— একথা বললে হয়ত সেভাবে দাঁড়াতো না। বরং বাংলা ও ইংরেজীর সমর্থক দু'টি দলের সৃষ্টি হতো এবং সম্ভবতঃ ইংরেজী সমর্থকের দলটিই হতো সংখ্যাগরিষ্ঠ। কারণ এতকাল মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজী ভাষা পড়ে ও শিখে অভ্যস্ত বলে ইংরেজীর প্রতি সবারই একটা আকর্ষণ ছিলো, তাছাড়া ভবিষ্যতে বাঙ্গালীদের বেলায় বাংলার এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অবাঙ্গালীদের বেলায় উর্দুর সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ভাষা শেখার একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে যেতো। এ ব্যবস্থা আগেও ছিলো। কাজেই এরূপ সিদ্ধান্ত কারো মাথা ব্যথার কারণ হিসেবে হয়ত দেখা দিতো না। উর্দু ভাষা দিয়ে রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক বাঙ্গালীদের মাতৃভাষাকে দাবিয়ে রাখার পরিকল্পনা যখন করা হলো তখনই বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলো। পরিকল্পনা পাল্টাতে হলো, উর্দুর সমপর্যায়ে বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হলো। একই দেশে রাষ্ট্রভাষা হলো দু'টো। বাঙ্গালী অবাঙ্গালী কেউ কারো ভাষা শেখবার চেষ্টা করলো না। ভাষাই ঐতিহ্যের বাহন, এই ভাষাগত বৈষম্যের দরুন দেশের দুই অংশের লোকের মনে সম্প্রীতি গড়ে উঠলো না। পাকিস্তান ভেঙে যেয়ে ভালো হয়েছে না মন্দ হয়েছে অথবা কার ভালো হয়েছে আর কার মন্দ হয়েছে কিংবা ভৌগোলিক বা পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিদ্বেষী মনোভাবের কারণে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বিঘ্নিত না হয়ে পারে না, সেসব তর্কে না যেয়ে অন্ততঃ এটুকু বলা চলে যে, এই বৈষম্যই পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হওয়ার অন্যতম কারণ।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেখা গেলো সবার মাতৃভাষাই বাংলা। পার্বত্য চট্টগ্রামের কোনো কোনো এলাকার আঞ্চলিক ভাষাই সেখানকার বাসিন্দাদের মাতৃভাষা, তবুও সে ভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা কোনো প্রকার সরকারী কাজে গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। রাষ্ট্রভাষা বাংলা হলো ঠিকই, তবে স্কুল-কলেজে এমনকি ডিগ্রী পরীক্ষা পর্যন্ত আগের মতোই ইংরেজী পড়ার ব্যবস্থা রয়ে গেলো এবং সরকারী ও বেসরকারী কাজকর্মে ইংরেজী ভাষাই ব্যবহার হতে লাগলো। দেশের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের খেয়াল হলো— তারা ভুল পথে চলছে। সঙ্গে সঙ্গে একুশে ফেব্রুয়ারীর আদর্শকে সমুন্নত রাখার ধ্বনি তুলে নানারূপ আদেশ-উপদেশ জারি হতে লাগলো—০ ইংরেজী হটাও এবং সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু কর। যাদের জন্ম ১৯৫২ সনের পরে অর্থাৎ যারা বাহান্নর ভাষা আন্দোলন দেখেনি শুধু শোনেছে এবং বই-পুস্তকে পড়েছে, আর দেখলেও মনে রাখার মতো বয়স যাদের তখন হয়নি, তাদের মুখেই সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু করার কথা জোরেশোরে শোনা যেতে লাগলো। যারা ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলো তাদের অনেকেই একথার বিরোধিতা না করলেও বাংলা ভাষা সর্বস্তরে ইংরেজী ভাষার স্থান দখল করে বসুক এতটা মনে মনে আশা করেনি, কারণ ছাত্র জীবন থেকেই ইংরেজী ভাষার প্রতি তাদের একটা মোহ সৃষ্টি হয়েছিলো। সরকারী পর্যায়েও এ আন্দোলন জোরদার হতে হতে বর্তমানে বাংলা ভাষা সর্বস্তরে চালু হয়েছেই বলা চলে। সরকারী, আধা সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত, এমনকি বেসরকারী শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বড় বড় কর্মকর্তারা যাঁরা ইংরেজীর মাধ্যমে লেখাপড়া শিখেছেন এবং এতকাল অফিসের কাজে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করে এসেছেন তাঁরা সবাই এখন বাংলা ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। বিদেশীরা বোঝবে না বলে তাদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষাকে বাধ্য হয়ে চালু রাখতে হয়েছে। ব্যাংক শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ বিশেষ সরকারী অফিস যেখানে বিদেশীদের সঙ্গে পত্রের আদান-প্রদান চলে সেখানে ইংরেজী ভাষা এতটুকুই চালু রাখা হয়েছে যেটুকু না হলেই নয়। স্কুল-কলেজে ইংরেজীর গুরুত্ব এখন আর নেই। ডিগ্রী পর্যায়ে ইংরেজী বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজী পড়ানো হচ্ছে ঠিকই তবে তার সুফল ভোগ করছে সেই ক'জন মেধাবী ছাত্র যারা কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করে কারিগরি বা পেশাগত শিক্ষাকে পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষা হিসেবে বেছে নিচ্ছে, যে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী ভাষা অথবা যারা বিদেশে যেয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের সৌভাগ্য নিয়ে জন্মেছে। বাকি শতকরা ৯০ জন শিক্ষার্থী নোট বই মুখস্ত করে কোনো রকমে পাস নম্বর সংগ্রহ করে ইংরেজীর দরিয়া পাড়ি দিচ্ছে। যেটুকু শেখার কথা তার এক-শতাংশও তারা শিখছে না। তারাই আবার ইংরেজীবিহীন ডিগ্রী পরীক্ষা পাস করে মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা করছে এবং ছাত্রদের ইংরেজী শেখাচ্ছে। এ শিক্ষার মান যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা সহজেই অনুমান করা চলে। এই শতকরা ৯০ জনের অনেকেই বিএ বা এমএ পাস করে চাকরি-বাকরির ধান্ধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মামার জোরে অথবা ঐ ধরনের অন্য কোনো উপায়ে যদি সরকারী অফিসে কেরানী পর্যায়ের কোনো চাকরিতে ঢুকতে পারে তো কথাই নেই, কারণ এরূপ চাকরিতে শিক্ষাগত যোগ্যতার তেমন প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু ইংরেজী ভাষা ভালোভাবে না জানার দরুন বিদেশী প্রতিষ্ঠানে তো বটেই দেশী বেসরকারী শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও অযোগ্য বিবেচিত হয়ে বেকারত্বের গ্লানি মাথায় নিয়ে শিক্ষিত যুবকদের নানারূপ অসামাজিক কাজে লিপ্ত হতে দেখা যাচ্ছে। এদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে।

এরূপভাবে অবহেলা না করে মাতৃভাষার পাশাপাশি আমাদের তরুণদের একটু কষ্ট করে হলেও ইংরেজী ভাষাটা যথাযথভাবে শিক্ষা করার ব্যবস্থা থাকলে পরিস্থিতি এতটা শংকটময় হয়ে দেখা দিতো না। ইংরেজীকে উপেক্ষা করে আমাদের কি যে লাভ হয়েছে, আর না করলে কি যে ক্ষতি হতো, এ প্রশ্নের সহজ উত্তর কারো জানা আছে বলে মনে হয় না। এতে কি বাংলা ভাষা শিক্ষার মান আশাতীতভাবে বেড়ে গেছে? বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কি খুব উন্নতি হচ্ছে? বাঙ্গালীদের জাতীয়তাবোধ, স্বদেশপ্রীতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য, সামাজিক সচেতনতা, এসবকি প্রশংসনীয়ভাবে উন্নীত হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে? ইংরেজ শাসনামলে যখন বাংলার সঙ্গে ইংরেজী বর্ণমালা শিক্ষা দেয়া থেকে শিশুদের ছাত্র জীবন শুরু হতো এবং মাধ্যমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম ছিলো ইংরেজীভাষা তখনও তো বাঙ্গালীদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিম, শরৎ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, সোহরাওয়ার্দী, ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী, আকরাম খাঁ প্রভৃতি মনীষীদের আবির্ভাব ঘটেছে। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে তাঁদের প্রতিভা

আলী হোসেন

তো মলিন হয়ে যায়নি। এরূপ কোনো প্রতিভা আমাদের মধ্যে আজো তো দেখা যায়নি। এঁদের সমতুল্য না হলেও মাথাতুল্য দু'চারজন যাঁরা আছেন তাঁরাও কিন্তু ইংরেজী শিক্ষায়ই শিক্ষাপ্রাপ্ত। তবে যদি বলা হয়, ভবিষ্যতে এঁদের চেয়েও বড় প্রতিভার আবির্ভাব ঘটবে তাহলে আর কিছুই বলার থাকে না, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েই বসে থাকতে হয়। ইংরেজী আন্তর্জাতিক ভাষা, ইংরেজী সাহিত্য অন্যতম বিশ্ববরেণ্য সাহিত্য। নিজেদের মাতৃভাষার সঙ্গে সঙ্গে অতীতে আমরা ইংরেজী ভাষা শিখেছি, ইংরেজী সাহিত্য থেকে জ্ঞান অর্জন করে নিজেদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছি। ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবেই তো মাইকেল বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ। সেই ইংরেজীকে কোনঠাসা করে আমরা যেন বহাদুর সেজে বসে আছি!

এবার অতীতের দিকে একটু নজর দেয়া যাক। বর্তমান বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁদের জন্ম বিশ বা ত্রিশ দশকে তাঁরা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে যা কিছু পড়েছেন একমাত্র বিজ্ঞানের অংশ ছাড়া সে সবের বিষয়বস্তু ও মান বর্তমানের তুলনায় ছিলো অনেক উন্নত। বিশেষ করে

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 SEP 1988
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

ঢাকাঃ রবিবার, ২৭ ভাদ্র, ১৩৯৫

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

তখনকার বাংলা ও ইংরেজী পাঠ্য তালিকা দেখলে বর্তমানের ছাত্ররা আঁতকে ওঠবে। ম্যাট্রিক (মাধ্যমিক) ক্লাসের ছাত্রদের যেসব কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প ও উপন্যাস পড়তে হতো দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেসব বিএ ক্লাসে পাঠ্য হতে দেখা গেছে। আইএ (উচ্চ মাধ্যমিক) পর্যায়ে ইংরেজী গদ্য, পদ্য, রচনা— এসব ছাড়াও গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিলো। যাঁরা সে সময় লেখাপড়া করেছেন তাঁরা বিবেচনা করে দেখতে পারেন তখনকার মান কি ছিলো আর এখন কি চলছে। পাঠক যদি আমার কথায় বিরক্ত না হন তবে বলতে পারি, আমরা নিজেরা ম্যাট্রিক ক্লাসে ইংরেজী যে কবিতা ও প্রবন্ধ পড়েছি এবং আইএ ক্লাসে যে উপন্যাস পড়েছি বছর দশেক পরে ঠিক সেসব বিএ ক্লাসের ছাত্রদের পড়তে দেখেছি। সত্যি কথা বলতে কি, তখনকার দিনে স্কুল-কলেজে মাতৃভাষা বাংলার তুলনায় ইংরেজী শিক্ষার মান ছিলো বেশী উন্নত এবং পাঠ্যসূচীও ছিলো ব্যাপক। ব্যাকরণের যা কিছু শিখবার ম্যাট্রিক ক্লাসেই শিখতে হতো। একমাত্র বাংলা ছাড়া আইএ থেকে এমএ ক্লাস পর্যন্ত যে কোনো বিষয় পড়ার মাধ্যম ছিলো ইংরেজী ভাষা। আমাদের অগ্রজ যাঁরা বাংলাতে এমএ পড়তেন তাঁদেরকেও দেখেছি ইংরেজীতে লেখা ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেনের 'History of Bengali language and literature' বইটি নাড়াচাড়া করতে। ম্যাট্রিক পর্যায়ে ইংরেজী, বাংলা ও অন্যান্য বিষয় ছাড়াও সপ্তম শ্রেণী থেকে আরো একটি ভাষা পড়তে হতো এবং ফাইনাল পরীক্ষায় অবশ্যই পাস করতে হতো। মুসলমান ছাত্রদের বেলায় আরবী, পার্সী অথবা উর্দু, হিন্দুদের বেলায় সংস্কৃত। আর যদি বৌদ্ধ ছাত্র থাকতো তারা পড়তো পালী। এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিলো বাল্য জীবনেই যার যার ধর্ম সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ করার সুযোগ দেয়া এবং সেই সঙ্গে আরো একটি ভাষা শিখবার আগ্রহ সৃষ্টি করা। এতে একটা মজার ব্যাপার এই ছিলো, কোনো মুসলমান ছাত্র যদি সংস্কৃত পড়তো তাকে পাঁচ নব্বর বেশী দেয়া হতো। তখনকার দিনে ম্যাট্রিক থেকে এমএ পর্যন্ত সবই ছিলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন। মুসলমান ছাত্রদেরকে হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য এটা ছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু কর্তৃপক্ষের নিছক একটা চাতুর্য। অথচ এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই এক সময় মুসলমান ছাত্র বলে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাকে সংস্কৃত পড়তে দেয়নি। এই নতুন আরো একটি ভাষা শিখবার প্রসঙ্গে ছোট বেলার একটি কথা না বলে পারছি না। আমার এক চাচা এবং আমি দু'জনে দুই স্কুলে পড়তাম, দূরত্ব ছিলো সাত/আট মাইল। চাচা পড়তো দশম শ্রেণীতে আর আমি নবম শ্রেণীতে। আমাদের মধ্যে কথা ছিলো প্রতি সপ্তাহে একজন আরেকজনের কাছে শুদ্ধ ইংরেজী ভাষায় চিঠি লেখবো। চাচা পড়তো আরবী, আমি উর্দু। একবার দেখি চাচা তার ইংরেজী চিঠির নীচে আরবীতে লেখেছে 'কায়ফা আন্তা'। আমিও আমার চিঠির শেষে লিখেছিলাম, 'আপ্ কেইছা হ্যায়'। ইংরেজী বাংলার মত না হলেও ম্যাট্রিক ক্লাস থেকেই এসব ভাষা সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান অবশ্যই হতো। আইএ এবং বিএ ক্লাসেও অনেকে এসব ভাষা অন্যতম পাঠ্য বিষয় হিসেবে বেছে নিতেন। আমি একজন মেধাবী ব্যক্তিকে জানতাম যিনি ঐ সপ্তম শ্রেণী থেকে পার্সী পড়া শুরু করে ম্যাট্রিক, আইএ পাস করে বিএ-তেও পার্সী পড়তেন। আমাদের মত নীচের ক্লাসের ছাত্রদের শেখ সা'দী ও কবি ফেরদৌসীর রচিত কাব্য সুর করে করে পড়ে শোনাতেন এবং বাংলায় তরজমা করে বুঝিয়ে দিতেন। পরে বিলাত থেকে ব্যারিস্টারী পাস করে এসে হাইকোর্ট বারে যোগ দিয়ে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। মাঝখানে রাজনীতি করতে যেয়ে দু'একবার হোঁচটও খেয়েছেন। এখনও হাইকোর্টে আছেন। এসব বলার উদ্দেশ্য হলো, ইচ্ছা থাকলে বাংলা ইংরেজী পড়ার পরেও আরো একটি নতুন ভাষা পড়তে বা শিখতে অসুবিধা হয় না। আর এখন বাংলার সঙ্গে ইংরেজী পড়তে গেলেই আমাদের বুদ্ধিমত্তা নষ্ট হয়ে যায়।

এভাবে লেখাপড়া শিখে তাঁরা যখন কর্মজীবন শুরু করতেন কোনো ব্যাপারেই অপারগ হতেন না। স্কুল-কলেজে সুনামের সঙ্গে অধ্যাপনার কাজ করতেন, আইন পাস করে বারে যোগ দিয়ে অল্প দিনেই সুখ্যাতি অর্জন করতেন, সরকারী-বেসরকারী এমনকি বিদেশী সংস্থায় চাকরি পেতে তাঁদের অসুবিধা হতো না, যাঁরা ব্যবসা করতেন দেশ-বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে কোটিপতি না হলেও অল্প দিনেই লাখপতি হয়ে উঠতেন। এঁরাই হতেন আইসিএস বা সিএসপি অথবা ইপিসিএস। এঁদের মধ্য থেকেই কেউ কেউ কবি, সাহিত্যিক বা সাংবাদিক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। দেশের বর্তমান বুদ্ধিজীবী সমাজে এঁরাই নেতৃস্থানীয়। সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু কর— একথা এঁরাও বলছেন, কিন্তু ইংরেজীকে উচ্ছেদ কর— সে কথা বলছেন না। মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজী ভাষা পড়বার বা শেখবার এঁরা পক্ষপাতী। এঁরা জানেন ইংরেজী পড়ে নিজেরা যেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, ইংরেজী না পড়ে কেউ তা হতে পারবে না। ইংরেজী না জেনে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসা চলবে না, দেশী বা বিদেশী বেসরকারী সংস্থায় চাকরি পাওয়া যাবে না, ইংরেজীতে লেখা আইনের বই, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বই, একাউন্টেন্সীর বই, উচ্চতর বিজ্ঞান, দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্রের বই পড়া যাবে না, শেক্সপীয়ার, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বায়রন, কীটস ও মিলটন পড়তে না পারলে কবি-সাহিত্যিক হওয়া যাবে না। ইংরেজী না জেনে অবাঙ্গালী বিদেশীদের সঙ্গে বন্ধুত্বও করা যাবে না। সার্ক সম্মেলনে কথা বলতেও ইংরেজীর প্রয়োজন। বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই বাংলাতে অনুবাদ করতে হলেও ইংরেজী জানতে হবে।

বাংলাদেশ অনুন্নত দেশ; বিশ্বের দরিদ্রতম দেশের সমপর্যায়ে অবস্থিত। দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা চলছে মাত্র। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম সঠিক পথে চালিত হচ্ছে না। দেশকে গড়ে তুলতে হলে আর্থিক, কারিগরি— বিভিন্ন ধরনের বৈদেশিক সাহায্য প্রয়োজন। বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে চলতে গেলে তাঁদের পরামর্শ পেতে হলেও ইংরেজী জানা চাই। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল খাদ্য সংস্থা বা উন্নয়ন সংস্থার কাছে হাত পাততে হলেও মুখে ইংরেজীতে কথা বলতে হবে। এমতাবস্থায় ইংরেজীকে অবহেলা করা কি ঠিক হবে? যদি ইংরেজীকে বাদ দিতেই হয় এখন নয়, অনেক পরে, নিজেরা আগে ঠিকঠাক হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তারপর চিন্তা করে দেখা যাবে। তাছাড়া শুধু উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত রেখে তার ওপরে ইংরেজীকে বাদ দেয়ার পেছনে সঠিক যুক্তিই বা কি আছে? আর দেরী না করে বিএ, বিকম ও বিএসসি পাস ও সাবসিডিয়ারী পর্যায়ে বাংলার সমমানসম্পন্ন ইংরেজী পাঠ্যসূচী অবশ্যই প্রবর্তন করা প্রয়োজন, যাতে শিক্ষার্থী বাংলা ও ইংরেজী— দুটো ভাষাতেই সমপরিমাণ জ্ঞান লাভ করতে পারে। এতে শিক্ষার্থীর ওপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি হবে মনে করলে অন্যান্য পাঠ্যসূচী কমিয়ে দেয়া যেতে পারে। ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, এমনকি বিজ্ঞানের বিষয়গুলোও বর্তমানে ডিগ্রী পর্যায়ে যা পড়ানো হয় তার চেয়ে কিছু কম পড়ালেও তেমন ক্ষতির কোনো কারণ নেই। আগেও তো কমই পড়ানো হতো। কোনো কোনো বিষয় নিজে নিজে পড়েও জ্ঞান লাভ করা যায়, কিন্তু ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য নিজে নিজে পড়ার বিষয় নয়। এর জন্য বিশেষ সাধনা ও অনুশীলন দরকার। যারা অনার্স পড়বে তারা বিশেষ কোনো বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠলেও সাবসিডিয়ারী পর্যায়ে বাংলা ও ইংরেজী দুটোই শিক্ষা করা থাকলে ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে বাড়তি একটা সুবিধা ভোগ করতে পারবে। বহুবিধ সমস্যা জর্জরিত আমাদের এদেশে শিক্ষানীতি প্রণয়নে, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী নির্ণয়ে সুচিন্তিত ও বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে না পারলে নতুন আরো সমস্যার সৃষ্টি হবে— যে সমস্যা কাটিয়ে উঠতে জাতির মেরুদণ্ডই হয়ত ভেঙে পড়বে।